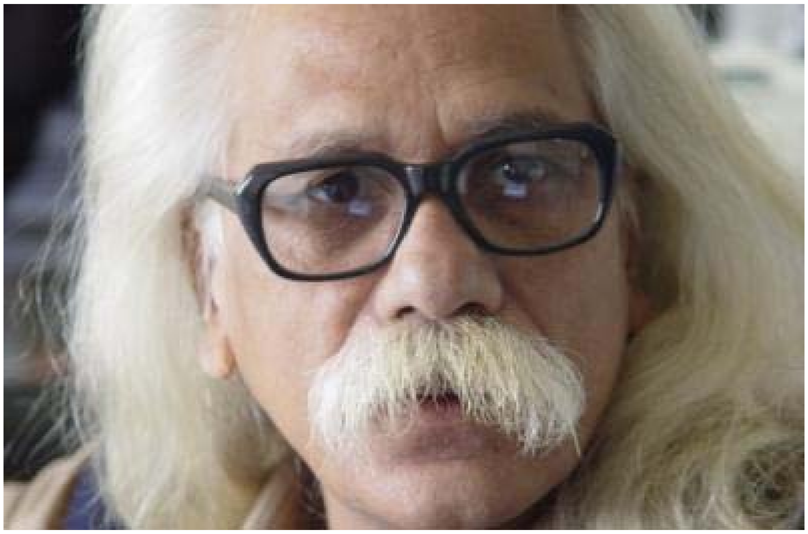

সমুদ্রের যে সমুদ্র গুপ্তই থেকে গেলো

-*রণদীপম বসু*

@ পথ চললেই পথের হিসাব

'তুমি বললে ফুল/ আমি বললাম কাগজের নিষ্প্রাণ গন্ধহীন/ তুমি বললে যাই হোক/ তবুও তো ফুল/ মানুষটা তো কাগজ কেটে কেটে/ কামান বন্দুক মারণাস্ত্র বানাতেও পারতো'...

মানুষের শ্রেয়বোধে এমন গভীর আস্থা ঢেলে যাঁর কলম থেকে এরকম সুর্বণ পঙক্তি ঝরে, তাঁর কি কোন অভিমান থাকতে পারে ? তবু ঝরে যাওয়া কালির মতো এরকম কিছু পঙক্তিচিহ্ন রেখে ঠিকই চলে গেছেন তিনি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কী এমন অভিমান তাঁর ?

'চুমু খেয়ে ঠোঁট সরাতে না সরাতেই/ তোমার ওষ্ঠ সরে যায়/ হাজার বছর খুঁজেও কেউ/ সেই চুমুর চিহ্ন খুঁজে পাবে না/ একই পথ একই পা পদক্ষেপ/ তবু প্রতিবার প্রতিটি চুমুর পরে/ তোমার ওষ্ঠ সরে যায়/ কেউ কোনদিন একই পথে দু' বার হাঁটে নি/... চুমু খেয়ে ঠোঁট সরাতে না সরাতেই/ তোমার ওষ্ঠ সরে যায়/ আমার স্মৃতিতে শুধু/ চুমুস্মৃতির খড় লটকে থাকে।'

--- (দুঃখ/ মাথা হয়ে গেছে পাখা শুধু ওড়ে)

এই লটকে থাকা স্মৃতির খড় খুঁজে খুঁজে এক জোড়া অবাধ্য পা টুঁড়ে বেড়িয়েছে এই বাংলার প্রতিটা জনপদ, নদীতীর, অরণ্য ; খুঁজে ফিরেছে নদী আর নদীর উৎসে ফেরার চিরায়ত সুর, মোহনার অন্ধকারে যা নাকি কেঁদে ওঠে বিহ্বলতায়। কুড়িয়েছে

কষ্ট, সুখ, আজন্মের না পাওয়ার ব্যথা। হাঁটতে হাঁটতে বৃক্ষের চোখে চোখ রেখে ডুবে গেছে অদ্ভুত সাযুজ্যে মাখা মানুষের অচেনা বোধের এক মায়াবী আঁধারী ডোবায়। কিছুতেই মানে না বিস্ময় ! তাই বুঝি লুকানো থাকে না তাও-

'পাতার মানচিত্র রঙ ও রেখা চেনা থাকলে/ গাছ চিনতে ভুল হয় না/... কথা, মানুষ-গাছের পাতার মতো/ কথার মানচিত্র রঙ ও রেখা/ আমাদের এক থেকে অন্যকে পৃথক করে দেয়/... কেবলই কাণ্ড শাখা বাকলসমেত দাঁড়িয়ে থাকলে/ মানুষকে আর চেনা যায় না'

--- (কথা বললে চেনা যায়/ মাথা হয়ে গেছে পাখা শুধু ওড়ে)

কী আশ্চর্য পারঙ্গমতায় আমরা বুঝে যাই, এই মানুষ চিরকালই অচেনা। তবু চলতে চলতে পথের ক্লান্তি এলে এই মানুষ-গাছের তলাতেই জিরিয়ে নিতে হয় তাঁকে। কেননা অচেনার সাথে চেনার মিতালী করেই তাঁকে যে পাড়ি দিতে হবে বহু পথ। আজন্মের উদ্দিষ্ট স্বপ্নের ঠোঁটে চুমু খাওয়ার যে দুর্বার মোহ তাঁকে পথে নামিয়েছে, তিনি জানেন এই পথেরও মোহনা থাকে নদীর মতো। আর নদী মানে জীবন, মানবিক প্রবাহ। ওখানে যে কুলকুল সুর বাজে তা শুধু জলের খেলা নয়, প্রবহমানতার চিরায়ত স্পন্দন। এ থেকে বিশ্লিষ্ট নয় কেউ। চাইলেও হতে পারে না। ওই মোহনার উদ্দেশ্যে মানুষ চিরকাল ছুটেছে, ছুটছে এবং ছুটবেও। নদী ছুটন্ত, মোহনা স্থির। বুকে নদীর স্বভাব নিয়ে যে মানুষটি এভাবেই ছুটে যায় আজীবন, তার সাথে কি নদীর সখ্যতা হয় শেষে ? এ প্রশ্নে এসে আমরাও থমকে যাই। তিনিই থমকে দেন আমাদেরকে। এক অনিঃশেষ বিভ্রমে জড়িয়ে দেন-

'অদ্ভুত চরিত্র নদীর/ এই কিছুকাল আগে যেখানে যেভাবে ছিল/ আজ আর সেখানে নেই/ আগামীকাল এখানে থাকবে না/ অদ্ভুত চরিত্র মানুষের/ এই কিছুকাল আগে যেখানে যেভাবে ছিল/ আজ আর সেখানে নেই/ আগামীকাল এখানে থাকবে না/ কেবলমাত্র স্বাধীনতার চরিত্র অপরিবর্তিত/ কিছুকাল আগে যেমন যেভাবে ছিল/ আজো সেখানে সেভাবেই আছে/ আগামীকাল এখানে এভাবেই থাকবে/
শুধু/ নদী ও মানুষেরা, অনেকেই/ স্বাধীনতা থেকে অনেকখানি প্রস্থান করেছে'

--- (শুধু নদী ও মানুষেরা/ মাথা হয়ে গেছে পাখা শুধু ওড়ে)

মানুষ ও নদীর সাথে আচমকা এই স্বাধীনতা নামের স্বপ্নবিভ্রমে জড়িয়ে পেঁচিয়ে আমাদেরকে হতবিহ্বল হতেই হয়। কেননা উদ্দিষ্টকে হাতের কাছে পেয়েও আমরা বিহ্বলতা মুক্ত হতে পারি না। কারণ কল্পনার যে আদি-বন্ধন বুকে ধারণ করে তাকে চেয়েছি আমরা, তাকে তো এর আগে দেখা হয়নি আমাদের। বহু ত্যাগ আর তিতিক্ষায় পাওয়া এই কি সেই আমাদের চাওয়া ? এ কেমন স্বপ্নমুখ !

'আমাদের ধূলি ও মাটির ছোট ঘরে/ স্বপ্ন এসে থানা গাড়লে আমাদেরই থাকার জায়গা থাকে না/ স্বপ্ন এলে ঘাটতি পড়ে কাঁথা বালিশ চাটাই/ আবার বাসন বাটি../ আমাদের গরীবের ঘরে/ স্বপ্ন যেন ধড়িবাজ পীর../ অতিকষ্টে গরীবের ঘরে যা কিছু বা খুঁদ কাঁকর জমে/ স্বপ্নের ঘুঘু এসে তাও খেয়ে যায়'

--- (স্বপ্নের ঘুঘু/ স্বপ্নমঙ্গল কাব্য)

আহা ! হঠাৎ করে আমাদের স্বপ্নগুলো এমন হয়ে গেল কেন ! তবে কি আমাদের চাওয়াতে ফাঁক ছিলো ? কল্পনায় খুত ছিলো ? না কি স্বপ্নটাই গড়া হয়নি কখনো ? যাকে এতোকাল সব পূরণের স্বপ্ন নামে ডেকে এসেছি, তাকে পেতে বিলিয়ে দিয়েছি বাদ বাকি সবকিছুই, সে-ই যদি এসে মুখ রাখে তলানিতে, এ কোন্ স্বপ্নের পিছে তবে এতকাল ছুটা ! বড় বেশি বাস্তব আর রুক্ষতায় খেয়ে ফেলে সময়ের সমস্ত সম্ভাবনা আমাদের। জীবনের জটিল মগ্নতায় দুঃস্বপ্ন তাড়িত বোধ আসলে

আমাদের স্বপ্নকে আর স্বপ্ন হয়ে ওঠতে দেয় না মোটেও। আমাদের দেখাগুলো নিমেষেই পাল্টে যায় ব্যাখ্যাহীন এক আচ্ছন্নতায়। স্বপ্নকে আর স্বপ্ন বলে মেনে নিতে দ্বিধামুক্তি ঘটে না আমাদের। স্বপ্নহীন সময়াক্রান্ত আমরা কিছুতেই যেন নিজেকে অতিক্রম করতে পারি না আর-

'স্বপ্ন এসে টোকা দিলে/ টোকা শুনে কপাট খুললে/ স্বপ্নের অশ্ব এসে পিঠ পেতে দেয়/ এখন এমন সময়/ অবলীলায় সেই অশ্ব/ দুঃস্বপ্নের ঘোড়া হয়ে যায়'

--- (সেই দিন/ স্বপ্নমঙ্গল কাব্য)

স্বপ্নের দ্বারা প্রতারিত হলেও মানুষ দুঃস্বপ্নের কাছে আপোস করে না কখনো। তবুও স্বপ্নগুলো যখন দুঃস্বপ্ন হয়ে যায়, মানুষ হয়ে যায় অবলম্বনহীন। আর এভাবেই বেড়ে ওঠা দুঃসহ অভিমানে হয়তো সব কিছু ছেড়েছুড়ে একদিন হয়ে যায় নিরুদ্দিষ্ট সে। এটাই কি মানুষের নিয়তি ! তিনিও কি তাই করেছেন ? এর উত্তর খুঁজতে গেলে যে ফের নতুন করে জীবন শুরু করতে হয় !

@ যে সমুদ্র গুপ্তই থেকেই গেলো

মানুষের কোন সীমানা নেই। এই অফুরন্ত সীমানা ভেঙে ভেঙে যিনি নতুন নতুন সীমানা গড়ে যান তিনিই কবি। আর সীমানা ভাঙার খেলা খেলতে খেলতে যিনি কবি না হয়ে ওঠলে তাঁর পরিচয় হতো সেই পৈত্রিক বন্ধনে মোড়ানো মিয়া আব্দুল মান্নান নামে, হয়তো কোন অখ্যাত গৃহকোণে আবর্তিত হতো তাঁর গার্হস্থ্য সুখের জীবন। তা না হয়ে তিনি হয়ে গেলেন এক বোহেমিয়ান সমুদ্র গুপ্ত। মানুষের চিরায়ত সমুদ্রটা যে তাঁর বুকে গুপ্ত হয়ে আছে, এই বোধ কখন এসেছিলো তাঁর ? যতটুকু জানা যায়, ২৩জুন ১৯৪৬ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার হাসিল গ্রামের পৈত্রিক ভিটায় পিতা মোহসিন আলী মিয়ার ঔরসে মা রেহানা আলীর গর্ভে জন্মানো শিশু মান্নান তার কৈশোর উত্তীর্ণের আগেই পিতার জীবিকা সূত্রে বাংলাদেশের ষোলটি জেলার স্কুলে পড়া আর ছাড়ার মধ্যদিয়ে মাধ্যমিক পাশ করেন। দুরন্ত কৈশোরে যার এভাবেই ঘুরে ঘুরে চৈতন্যের শুভ্র পায়ে আঁকা হয় মানুষের বিচিত্র জীবন আর ঘরছুট নদীর স্বভাব, নিরীহ ঘরের কোণ তাকে কি বাঁধতে পারে আর ! সেই যে হাঁটা শুরু করলেন তিনি, আর কি থেমেছেন ? না, থামেন নি। নদীর মতোই গন্তব্য গড়েছেন মানুষ নামের মানুষের বুকের সমুদ্র খোঁজায়। জীবনভর নদীর স্বভাব নিয়ে নদীই তাড়িত করেছে তাঁকে। তাই তো তিনি নদীর উৎস খুঁজে কোথায় কোথায় চলে যান, চলে যান নদীর গন্তব্যেও।

বিএ পাশ করে তারুণ্যে বোহেমিয়ান সমুদ্র তখনো সমুদ্র হয়ে ওঠেন নি। ছয়ের দশক বা প্রচলিত অর্থে ষাটের দশকের উত্তাল সময়টাতে পৈত্রিক নামেই ঝরাচ্ছেন পঙক্তিমালা। ঢাকায় সংবাদকর্মীর প্রকাশ্য ঠিকানা গেড়ে তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসকের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তুমুল উৎকণ্ঠায় জড়িয়ে গেছেন বামপন্থী ভূতলরাজনীতির অনিবার্যতায়। গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জড়িত তিনি। বাঙালির ইতিহাসের রক্তাক্ত আর আলোকিত ঘটনাপুঞ্জের সাক্ষীও হয়ে যাচ্ছেন একে একে। এভাবেই একজন সমুদ্র গুপ্তের উত্থানকে ধারণ করে একজন আবদুল মান্নান, মুক্তিযোদ্ধা নং- ১১৮৮ যখন অস্ত্রহাতে বিজয়ীর বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন, তখন তিনি যে সর্ম্পূণই একজন সমুদ্র গুপ্ত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীন দেশে নিশ্চিত জীবিকার সংস্থানে না গিয়ে ফের হাতে তুলে নেন স্বপ্নের কলমটাকেই। এভাবেই বুঝি নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে যায় বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য কখনোই পাওয়া হবে না তাঁর। পাননিও। যে কিনা মাটি আর মানুষের স্বাধীনতাকে উদ্দিষ্ট করে এক তুমুল স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে সমুদ্রের উপমা ধারণ করেন, তাঁর কাছে এই তো স্বাভাবিক। নইলে কী করে

বলেন তিনি-

'আমার স্বপ্নের সেই সোনালী বৃদ্ধকে আমি/ অভিবাদন জানাবো/ যিনি আমাকে তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে/ দিন দিন শিক্ষিত করে তোলেন, যিনি/ তাঁর কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজ/ একটি একটি করে খোলেন, আর/ আমাকে দেখান/ মানুষের কব্জির যাবতীয় কাজ ও কারুকাজ/ তিনি দেখান আর বলেন কোমল স্বরে/ শ্রেণীযুদ্ধের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস/ আমার চোখের সামনে একেকটি প্রাচীন গুহামুখ/ খুলে যায় নিঃশব্দে/ বৃদ্ধের দুই চোখ জ্বলে ওঠে/ মোমবাতির শিখার মতো সাবলীল নরোম আলোয়/ আমি শতাব্দীর পর শতাব্দী/ লক্ষ বছর ধরে হেঁটে যাই পা গুণে গুণে/ চোখে খোলা তলোয়ারের ঝিলিক/ আঙুল জ্যামিতিক কাঁটার মতো র্নিভুল, আর/ নিঃশ্বাস পিঁপড়ের চেয়েও বেশী র্স্পশপ্রবণ/
প্রত্যেক যাত্রার শেষে সেই সৌম্যবৃদ্ধ বলেন/ মানুষের ইতিহাস ক্রমশঃ এগোয় সম্মুখে/ সমৃদ্ধতর এবং বেঁচে থাকার দিকে/ আমি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠি, মুহূর্তেই শিখে ফেলি/ মানুষের চেতনা যতোই স্বপ্নাবৃত থাক/ একদিন এই স্বপ্ন ভাঙবেই/ স্বদেশের মানুষেরা ফিরে আসবে মাতৃভূমির স্বাধীনতার দিকে/ এবং/ রৌদ্রের বিপরীত ঝিলিকে ঝিলকে উঠবে জীবনের চোখ/ আমি/স্বাধীনতার তুমুল লড়াই শেষে/ করর্মদন করবো আমার স্বপ্নের সেই সোনালী বৃদ্ধকে/ আমি তাঁকে জানাবো অভিবাদন/ যাঁর/ র্নিভুল র্নিদেশে/ রাত্রি শেষের মোরগের মতো ডেকে ওঠে আমার জীবন'
--- (আমার স্বপ্নের সেই সোনালী বৃদ্ধ/ র্কাল র্মাকস এর জন্মদিনে)

এই শিক্ষিত র্নিদেশনাকে পাথেয় করেই আর্বতিত হতে দেখি একজন সমুদ্র গুপ্তের র্দুমর কবি জীবন। এখানেই উপ্ত রয়ে গেছে তাঁর বিশ্বাস, র্নিভরতা এবং সামগ্রিক র্দশনটাও। ষাটের দশকের অন্যান্য কবিদের সাথে সমুদ্র গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গিগত যেটুকু র্পাথক্য তা যেমন এখানে চোখে পড়ে, সাদৃশ্যটাও এখানে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক রাজনৈতিক কারণেই বক্তব্যে উত্তাপ, র্বণনায় সরলরৈখিক স্পষ্টতা আর শিল্পগভীরতাকে অস্বীকার করে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার স্বাধীনস্পৃহায় ওই দশকের কবিদেরকে তীব্রভাবে আক্রান্ত হতে দেখি। অধিকার আদায়ের উত্তাল চেতনা ধারণ করে খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই শিল্পের চাইতেও জরুরি হয়ে ওঠে মানুষের স্বাধীনতাবোধ। কবিও সমাজের বাইরের কেউ নন। বরং অগ্রর্বতী সামাজিক মানুষ। শিল্পের হাতিয়ার নিয়ে তাঁকেই তো এগিয়ে আসতে হবে আগে। তাই শিল্পের ঘোরপ্যাঁচের চাইতে বক্তব্যের ঋজুতাই সময়ের দাবী হয়ে ওঠে আসে কবিতায়। শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতা বুঝি একেই বলে। আর এ কারণেই সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে সমুদ্র গুপ্ততেও দেখি কবিতায় নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পসুষমা মেনে পঙক্তির চিত্রকল্প বুননের চাইতেও জরুরি হয়ে ওঠে বক্তব্য প্রকাশের শিল্পদক্ষতা। কবি হিসেবে যেমন শিল্পের দায় এড়াতে পারেন না, তেমনি সমাজ ও সময়ের দাবীও উপেক্ষা করেন না তিনি। এ দুয়ের মিশেলেই গড়ে ওঠেছে তাঁর কবিতার শিল্পবৈভব।

'ছেলেবেলায় একবার এক/ সম্পন্ন আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে গিয়ে/ কারুকার্যময় আলমারির ভিতরে রাখা/ সুন্দর পুতুল দেখে হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়ে/ আলমারির কাঁচ ভেঙে ফেলেছিলাম/ পুতুলের কাছ থেকে ফিরে এসেছিলো/ রক্তাক্ত ক্ষুব্ধ আঙুল/ যৌবনে-/ চমৎকার তিল দেখে/ হাত দিয়ে ছুঁতে যেতেই/ তোমার লাল গাল থেকে/ উড়ে গেলো মাছি/
এখন তো/ চতুর্দিকে দেখতে শুনতে/ চলতে ফিরতে শুধু বিভ্রান্তই হই/ খরায় বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে/ আকাশ দেখতে দেখতে যখন/ মেঘ দেখে উৎফুল্ল হই/ অকস্মাৎ বুঝে ফেলি/ মেঘ নয় আকাশ রেখেছে ঢেকে/ আণবিক ধোঁয়া/
গমের শিষের মতো কোমল/ আমার স্বপ্ন যখন/ শিশিরের স্বপ্নে বিভোর/
ভোর না হতেই এই/ আমাদের প্রশান্ত আকাশে জমে/ পরমাণু বিস্ফোরণের ধোঁয়া/
ভেজা ঠোঁট দেখে যখন ভাবি/ চুম্বনের এই বুঝি উৎকৃষ্ট সময়/ ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে যেতেই দেখি/ ঘৃণা যেন জমাট চাঁচের মতো/ কঠিন জমেছে'

--- (বিভ্রম/ স্বপ্নমঙ্গল কাব্য)

এমন বিভ্রম সমুদ্রের কবিতায় প্রায়শই দেখি আমরা। এ বুঝি তাঁর দীর্ঘ ভ্রমন অভিজ্ঞতার নির্য্যাস। এ ভ্রমন তাঁর কবিতার, পরিযায়ী জীবনের। তাঁর অর্ন্তগত কবিসত্তার র্মমভেদী দৃষ্টি তাই সেই সব সত্যগুলোকে কী র্নিমম শিল্প আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলে। তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি। যাযাবর মনে গৃহের ঘেরাটোপে স্বস্তি কোথায় ! মুক্ত আকাশের টানে মাটির টানে বেরিয়ে পড়তেই হয় তাঁকে। এই মাটি তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়ে বিছিয়ে রেখেছে স্বপ্নের আঁচল। যেখানে নদী আর সবুজে জড়াজড়ি করে থাকে সেই বাস্তুভিটার সন্তান তিনি এই মাটিকে চেনেন গভীর, দেখেন আরো গভীর করে। তাই তো মুঠো ভরে তুলে নেন যে মাটিকে, তা কি শুধুই মাটি ? মানুষ ভুলে গেলেও মাটি তার ঐতিহ্য ভুলে না। সমুদ্র তা জানেন বলেই দৃষ্টি তার চলে যায় মাটির গোপন শিকড়ে, যেখানে লেখা থাকে সেই রক্তাক্ত ইতিহাস গাঁথা। সমুদ্র তাও পড়ে শোনান আমাদের-

‘আর্দশ র্বগ আয়তনে/ সন্নাপো ক্ষুদ্র পরিমাপের/ একখন্ড মাটি নিয়ে হাতে তুলতেই সন্দেহ হলো/ লাল নাকি ! মাটির মতো লোহাও লবন !/
নানান চেহারা ছবি নানান ভঙ্গি/ একটুকরো মাটির র্বগে/ একেক আলোর নিয়মে একেক ঘটনা ফোটায়/
অজ্ঞান হতে হতে মানুষেরা বিস্মিত হতে পারে/ তবু, মাটি ধরে রাখে/ আকাশের নীচের সকল ঘটনা/
মাটি মাটিতে রাখলে মাটি/ হাতে তুলে নিলে এই বাংলার মাটি/ রক্তে ভিজে যায়’

--- (এই বাংলার মাটি)

কী স্বপ্নসন্ধ উচ্চারণ ! মাটি মাটিতে রাখলে মাটি, হাতে তুলে নিলে এই বাংলার মাটি রক্তে ভিজে যায় ! কলমের একটা আঁচরে এমন শেকড়ছোঁয়া উচ্চারণ বাংলা কবিতায় খুব কমই চোখে পড়ে। এরকম উজ্জ্বল পঙক্তি সমুদ্রের কম নেই। সমুদ্রের আরেকটি যে বিশেষত্ব তাঁকে বিশিষ্ট করে রেখেছে, ভালোবাসা এবং দেশপ্রেম তাঁর কবিতায় গলাগলি করে হাঁটে-

‘ভালোবাসা হচ্ছে এক প্রকার পাথর/ দুজনে এক সাথে ছুঁয়ে দিলে/ নড়ে চড়ে কথা বলে, আলো বিকীরণ করে/ ছুঁয়ে না দিলে/ আলো না জ্বললে/ ভালোবাসা কেবলই পাথর/
দেশপ্রেম কেবলই বরফ/ মিছিলের উত্তাপে গলে’

--- (পাথর ও বরফ)

সমুদ্রের খুব কম কবিতাই রয়েছে যেখানে স্বাধীনতার বোধ উচ্চকিত থাকে না। এটা তাঁর বিশ্বাস ও র্নিভরতা, অন্যদিকে অভাববোধও। বন্ধনমুক্তির অবচেতন ইচ্ছাই তাঁকে এভাবে চালিত করে। সুদৃশ্য ষ্ট্যালিনগোফ আর নদীর বহতা মাখা শুভ্র দীঘল চুলের সন্তচেহারার এ কবিকে যারা কাছে থেকে দেখেছেন তাদের কাছে ষাট পেরনো সমুদ্র গুপ্ত আর ঘাট পেরোনো নদীর সাথে কোন তফাৎ ছিলো কি ? কোন বাঁধা না মানার স্বভাবপ্রিয়তাকে তিনি তাঁর কবিতায়ও স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছেন। এজন্যেই কি তিনি তাঁর কাব্যের প্রকরণশৈলীতে কোন বিরামচিহ্ন বিশেষ করে র্পূণযতি বা দাড়ির ব্যবহার এড়িয়ে গেছেন সযত্নে ? পাঠকের স্বাধীনতাকে উন্মুক্ত করে দিতেই কি উন্মুখ তিনি ? আর স্বাধীনতার অনুষঙ্গ হিসেবে নদী গাছ মানুষকেই তাঁর পর্য্যবেক্ষণের প্রধান ও প্রিয় বিষয় করে নিয়েছেন।

‘স্বাধীনতা জিনিসটা অন্যরকম/ একেক পরিপ্রেক্ষিতে একেক বিষয়কেন্দ্রে/ একেক পরিস্থিতিতে একেক চাহিদাক্ষেত্রে/ স্বাধীনতার একেক চেহারা/
আজ যা তোমার স্বাধীনতা/ একই সাথে অন্যের ক্ষেত্রে বিপরীত/ আবার/ সহসাই এটির চিত্র ও ভঙ্গি পাল্টে যায়/
নদীর স্বাধীনতা/ কখনো উৎসে কখনো মোহনায়/ কখনো কেবলি তার আকুল যাত্রার স্রোতে/

মানুষের স্বাধীনতা/ প্রতিদিন একই অবস্থানে থাকে/ মানুষ কখনো স্বাধীনতার নিকটর্বতী হয়/ আবার কখনো দূরে সরে যায়’
--- (মানুষের নিয়ম)

‘তোমরা কীভাবে যে কি কি বলো বুঝতে পারি না/ নদীর চলে যাবার কথা বোঝা যায়/ নদীর থেমে থাকার কথা বোঝা যায়/ ঘাস খেতে খেতে/ বাছুরের মাথা তুলে আকাশ দেখার কথা বোঝা যায়/ মেঘ ও বৃষ্টির ভাষা বোঝা যায়/ পথ ও বিপথের কথা বোঝা যায়/ সন্ধ্যা কিংবা সকাল/ বৃষ্টি ও রোদের ভিতরে গাছের ভাষা বোঝা যায়/
চাল কিভাবে গুমরাতে গুমরাতে ভাত হয়/ তা-ও বোঝা যায়/ কিন্তু/ তোমরা কি কি যে কীভাবে বলো বোঝা যায় না’
--- (বন্ধুদের প্রতি)

যে কবি অনায়াসে নদীর ভাষা বোঝেন, বাছুরের ভাষা বোঝেন, মেঘ বৃষ্টি পথের ভাষা বোঝেন, বৃষ্টি ও রোদের কিংবা গাছের ভাষা বোঝেন, শেষপর্যন্ত উদ্দিষ্ট লক্ষ্য যাঁর মানুষের বুকের কন্দরে থাকা অব্যক্তের সন্ধান, সেই তিনি মানুষের ভাষা বোঝেন না ! যারা তাঁর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে, চা খায় গপ্পো করে, এতোকাল যারা তাঁর সহচর তাদের ভাষা বোঝেন না ? এখানেই সমুদ্র গুপ্তের কাব্যিক অনন্যতা। সহজ সরল প্রকৃতির নির্সগের মধ্যে কোন লোভ থাকে না লালসা থাকে না কৃত্রিমতা নেই বলে প্রকৃতি বিশাল সুন্দর স্বচ্ছ এবং লাবণ্যময়। তাকে বোঝা যায়। হানিকর নয় বলে বুকে টেনে নেয়া যায়। অন্যদিকে মানুষ কৃত্রিমতায় আবিষ্ট এক জটিল সত্তা। ক্ষণে ক্ষণে পরির্বতনশীল বহুরূপী এবং কুটিলতা আর প্রচন্ড আত্মকেন্দ্রীকতায় আচ্ছন্ন। কবির সহজ স্পন্দনে এই জটিলতা তাঁকে বিক্ষিপ্ত করে, ক্ষুব্ধ করে, কষ্ট দেয় এবং কখনো কখনো মানুষকে মানুষ বলে চিনতেও বিভ্রম জাগে। আজীবন মানুষের শ্রেয়বোধে আস্থাশীল কবি তাই এই হতাশাই ব্যক্ত করেন পঙক্তিতে পঙক্তিতে। মানুষের প্রতি বিশ্বাসবোধের এ এক ভিন্ন উপস্থাপন। একই ভাবে নাগরিক জীবনের তুমুল অসংগতিগুলোও কী চমৎকার ক্ষীপ্রতায় পঙক্তিলগ্ন হয়ে ওঠে-

‘তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে সভা শেষ হলে/ বক্তৃতার মধ্যেকার মিথ্যাগুলো/ বাদুড়ের মতো উড়ে যায় বিভ্রান্তির অন্ধকারের দিকে/ সেখানে রয়েছে স্বার্থের ডাঁসা পেয়ারা/ খাবে কামড়াবে ছড়াবে ছিটকাবে আর/ বাকিটা নষ্ট করবে এমনভাবে যেন/ অন্য কারও আহারে রুচি না হয়/ তুমুল করতালির মধ্যে দিয়ে সভা শেষ হলে/ বক্তৃতার মধ্যেকার ধাপ্পাগুলো/ উকুনের মতো দৌড়াতে থাকে লোভের চামড়ার দিকে/ সেখানে রয়েছে এঁটে রক্তের সূক্ষ ফোয়ারা/ কামড়াবে খাবলাবে আঁচড়াবে আর/ চামড়ার ঘা বানাবে এমনভাবে যেন/ নখ আঙুল বা চিরুনির দাঁত লাগাতেও বেদনা হয়/
তুমুল করতালির মধ্য দিয়ে সভা শেষ হলে/ সকলেই চলে যায় আপন গন্তব্যে, শুধু/ সভাস্থলে পড়ে থাকা সত্যের লাশ দেখে/ বাস্তবতা কাকের মতো ওড়ে আর হাহাকার করে/ কারোই কুড়িয়ে নেবার মতো কিছুই আর থাকেনা পড়ে’
--- (সভা শেষ হলে)

এই নাগরিক বোধ আসলে তিনি রপ্ত করেছেন সম্পন্ন কবিজীবনের শুরুতেই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রোদ ঝলসানো মুখ’ প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। এর আগের দু’দশকের একটানা কবিতার্চচায় তিনি ছড়া বা পয়ারসুলভ সমিল কবিতা লিখেছেন প্রচুর। কিন্তু প্রথম বইয়ের প্রথম কবিতাটিতে ছন্দোমুক্তির আভাষ দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন ওগুলো ছিলো তার শিল্পব্যাকরণে ঋদ্ধ হয়ে ওঠার প্রস্ততিকালের র্চচা। পরিণতপর্ব্বে আর কখনোই ফিরিয়ে আনেননি তিনি। গ্রন্থবদ্ধ প্রথম কবিতাতেই ব্যবহার করলেন এক অদ্ভুত প্রতীকী। রাজপথে নির্বিকার শুয়ে থাকা একটি কুকুর হয়ে গেলো স্বদেশভূমির অভূতপূর্ব্ব প্রতীক !

‘রাস্তার মধ্যিখানে শুয়ে আছে নির্বিকার একটি কুকুর/ গাড়ি ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে এদিক ওদিক/ পাশ কেটে কুকুরের মাথার, ছায়ার/ প্রাণহীন কুকুরের হৃদপিণ্ড কুঁকড়ে গেছে/ খামচে ধরে রাজপথ কোঠাবাড়ি নাগরিক বিশাল শহর/

বড়লোক গাড়ির নীচে চাপা পড়ে মানুষ আর/ মানুষের সরল জীবন- এটাই নিয়ম, অথচ/ কি তাজ্জব ! সমস্ত বিত্তশালী গাড়ি ঘোড়া/ সর্তক স্টিয়ারিংয়ে পাশ কাটছে/ শুয়ে থাকা কুকুরের লাশ/ যেন, এই লাশটাকে বাঁচাতেই হবে/
পৃথিবীর রাজপথে চিৎপাত শুয়ে থাকা/ এরকম কুকুরের লাশ যেন বাংলাদেশ/
আসলে তো, বাংলাদেশ মানেই হলো/ জীবনের মুখোমুখি বুলেটের অসভ্য চিৎকার/ শোকচিহ্ন কালোব্যাজ পৃথিবীর শহীদ মিনার'
--- (কুকুর/ রোদ ঝলসানো মুখ)

রাজনীতি সচেতন আপাদমস্তক কবি সমুদ্র গুপ্ত। প্রথম গ্রন্থেই দেয়া এই উজ্জ্বল পরিচয় পরর্বতী গ্রন্থগ্রন্থগুলোতেও সমানভাবে দীপ্যমান। তীব্র যে জোয়ার বুকে নিয়ে লিখে গেছেন অজস্র, সে তুলনায় তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ কি খুব পেয়েছি আমরা ? রোদ ঝলসানো মুখ (১৯৭৭), স্বপ্নমঙ্গল কাব্য (১৯৮৮), এখনো উত্থান আছে (১৯৯০), চোখে চোখ রেখে (১৯৯১), একাকী রোদ্রের দিকে (১৯৯২), শেকড়ের শোকে (১৯৯৩), ঘাসপাতার ছুরি (১৯৯৮), সাত সমুদ্র (১৯৯৯), নদীও বাড়িতে ফেরে (২০০০), ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেই পথ (২০০৩), চলো এবার গাছে উঠি (২০০৪), হাতে তুলে নিলে এই বাংলার মাটি রক্তে ভিজে যায় (২০০৬), মাথা হয়ে গেছে পাখা শুধু ওড়ে (২০০৮), তাহলে উঠে দাঁড়াবো না কেন (২০০৮), ডিসেম্বরের রচনা (২০০৮) এবং যৌথগ্রন্থ 'মুক্তডানার প্রজাপতি' (২০০৬)। একটা সমুদ্রকে কি এই ক'টা পাড় দিয়ে বেধে রাখা যায় ? কূলপ্লাবী স্রোতে জলে আরো যে সব উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কবিতা গদ্য প্রবন্ধ আলোচনা ও বক্তৃতা হয়ে ওগুলো যে শঙ্খের মতো সমুদ্রের স্বরকে ধারণ করে নি তা কি বলা যায় ? মুক্তবাণিজ্যের যুগের কোন প্রকাশক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উদ্যোগ নিলে হয়তো আমরা পেয়ে যেতে পারি সেই গুপ্ত সমুদ্রকে, যেখানে এক আজন্মের কবি সমুদ্র ডুব মেরে ছিলেন বহুকাল। সময়ের শুদ্ধ ডুবুরীরা তা কি তুলে আনবে না ?

@ ঝিনুক নীরবে সয়েই যায়

'কে যায় আর কে কে আসে/ বোঝা যায় না/ বিশাল চওড়া পথে/ কতো মানুষ কতো যানবাহন/ এইসবের/ কারা যায় আর কারা আসে/ কে জানে/
যাকে দেখা যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে/ অথচ সে যাচ্ছে না/ তার গন্তব্য থেকে বোঝা যায় সে যাচ্ছে না/ আসছে সে/
আমাদের গমনগুলো/ কীভাবে যে বদলে গেছে কবে/ বোঝাই যায়নি/
এখন সকলেরই যাওয়া কেবলই যাওয়া/ যেন কোন গন্তব্য নেই/ সম্মুখ ও পশ্চাত সব একাকার/ সামনে ও পেছনে বলে কোন পর্দাথ নেই/
যেন, যাওয়াটাই উদ্দেশ্য কেবল/ যাওয়াই জীবন/ আমাদের কালে/ ফিরে আসা বলে কোন কথা যেন নেই'
--- (সম্মুখ ও পশ্চাত আজ একাকার/ মাথা হয়ে গেছে পাখা শুধু ওড়ে)

ঝট করে তাঁর এ কবিতাটাই মাথায় এলো, যখন শুনলাম তিনি র্অথাৎ কবি সমুদ্র গুপ্ত গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী। অবস্থা আরো সঙ্গীন হলে তাঁর বন্ধু ও সহচর কবিদের সহযোগিতায় তাঁকে বারডেম থেকে স্কয়ার হাসপাতালে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা হলো। স্ত্রী সোহানা হ্যাপী, দুই কন্যা নীল সমুদ্র ও স্বপ্ন সমুদ্রকে নিয়ে একটা মানবিক সুখী গৃহকোণ থাকা সত্ত্বেও আজীবন বোহেমিয়ান কবি যে নিজের জন্য পরিবারের নিরাপত্তার জন্য কিছুই করেন নি, তাঁর এ বিশাল চিকিৎসা ব্যয়ের প্রথম ধাক্কাতেই যা কিছু অস্থাবর চলে গেছে সব। এরপর প্রতিটা মুর্হূত মানেই ক্ষয়ে

যাওয়া জীবনের বিশাল সঞ্চয়। এ সঞ্চয় কোন বস্তুগত সম্পদ নয়, বড় বেশি মানবিক, জীবনের অনিবার্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাস। ১৯৭০-এর গোর্কীর থাবায় লণ্ডভণ্ড বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ভোলা ও মনপুরায় দীর্ঘদিন অবস্থান করে ত্রাণকার্য পরিচালনা, ১৯৮৮ এর বন্যায় ত্রাণকাজে ঝাপিয়ে পড়া, ১৯৯১ এর চট্টগ্রাম উপকূলে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোনে মুছে দেয়া প্রায় কুতুবদিয়া, মহেশখালি ও কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় তিনমাসব্যাপী উদ্ধার ও ত্রাণকাজে লেগে থাকার মতো আরো বহু দুর্যোগে দুর্দিনে সাধারণের পাশে নিজেকে স্বেচ্ছাত্যাগকারী কোনো মানবিক কবিসত্তা যখন তাঁর ক্ষীয়মান দেহ নিয়ে হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকে চিকিৎসাহীন অনিশ্চয়তায়, বুঝতে হবে এ জাতিই অসুস্থ। বিবেকের ঘরে বাসা বেঁধে আছে দুঃসময়ের ঘূণ। কোথায় ছিলেন না তিনি ? বাঙালির এমন কোন আন্দোলন সংগ্রাম মিছিল মিটিং কিংবা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা বৈঠক সভা কি বাদ পড়েছে, যেখানে একজন তরুণ আব্দুল মান্নান থেকে সব্বশেষ স্ট্যালিনময় সুপুষ্ট গোঁফ আর চাঁদমাখা উচ্ছল নদীমাখা শুভ্র দীঘলকেশী সন্তের মতো চিরপরিচিত মুখটি কখনো তাঁর নিজস্ব আলো ছড়িয়ে যায় নি ? এক লহমায় কোন ফাইভস্টারের বুফে আর বলরুমে যারা নির্দ্বিধায় উড়িয়ে দেয় লক্ষ লক্ষ টাকা, তাদের এক কামড় ভিনদেশী ফ্রাই থেকে বেশি দামী নয় কবির জীবন। আমাদের ওই সব দেশীয় অহঙ্কারদের কানে একজন মুর্মূষু কবির বাঁচার আর্তি পৌঁছাবে কেন !

যাদের একবেলার সংস্থান হলে আরেক বেলা পড়ে থাকে অনিশ্চিৎ, শেষমেশ তারাই এসেছে এগিয়ে। তাদের প্রাণের দোসর একজন কবিকে তারা যেতে দেবে না। কিন্তু তাদের সাধের কাছে সাধ্য যে নগন্য খুব। মূল্য দিয়ে যা কেনা যায় না কখনো সেই অমূল্য অফুরন্ত ভালোবাসায় কবি তাঁর অর্মত্য স্বীকৃতি হয়তো পেলেন ঠিকই, কিন্তু হাসপাতালের বিল পরিশোধে ভালোবাসা যে অক্ষম। এই উন্মুক্ত বাণিজ্যের কালে ভালোবাসা বৈধ কোন কারেন্সী নয়। তবু কোন চেষ্টা তো বৃথা হয় না কখনো। ওই সব অসংখ্য নগন্যের তিলে তিলে গড়ে তোলা মর্হাঘ সমষ্টিমান অনিবার্য প্রয়োজন ছুঁতে ছুঁতেই দেহের অরক্ষ্য ঘূণে খেয়ে গেছে সব। অতঃপর সমুদ্রের নামে পড়েছিলো যা, শুধু কি সমুদ্রের খোলশ ?

'এইভাবে বিবাদ ও বিষাদে অন্তহীন ডুবে যাওয়া/ কতদিন আর কতকাল/ দ্বিধাহীন দ্বিতৃহীন একক সঞ্চারে/ চেয়ারের হাতলের সাথে স্ট্যাটাসের শিকলে বাঁধা হাত/ যেন চারপাশে আর কিছু নেই কেউ নেই/
আমরা কি ভুলে যাবো ডুমরিয়া আত্রাই পেয়ারা বাগান/ হাকালুকি শীতলক্ষার রক্তরাঙা জল/ নড়াইল আর চিত্রার অবস্থান একটুয়ো না পাল্টানোর স্মৃতি কি/ স্মৃতি থেকে বিস্মৃতির অতলে তলাবে/
এইভাবে স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে আবর্তিত হতে থাকা/ কতদিন আর কতকাল/ মন ও মননের অমন উত্থান কি আবার আসবে না/ হাওয়াতে কান পেতে থাকি/ নাকশীর্ষে জাতীয় পতাকার মতো ওড়ে মাছি/ হে মাছি/ স্বপ্নের দ্রুততায় পক্ষ ঘূর্ণনে শরীরে বসো না হে/ এখনো মরিনি আমি বেঁচে আছি'
--- (মাছি)

আহ্ ! চলৎশক্তিহীন কবির আর্তি কি ওই মাছি শুনেছে আদৌ ? তাঁর বিভ্রম জাগানো স্বপ্নের মতোই এই মৃত্যুর মাছিটিকে কেউই তাড়াতে পারলো না আর ! ১৯ জুলাই ২০০৮, ব্যাঙ্গালোরের সুরক্ষিত হাসপাতালের বেডে ওই মাছি তাঁর নাকশীর্ষে বসে গেলো ঠিকই। ##

|Samudra Gupta, the hidden ocean/Ranadipam Basu|